দুনিয়া বদলে দেয়া লাইব্রেরিগুলো

বিচিত্রি ডেস্ক

গ্রন্থাগার শুধু বইয়ের সংগ্রহশালা নয়, বরং এটি সভ্যতার এক জীবন্ত দলিল। প্রাচীন আসুরবানিপালের কীলকবর্ণের শিলালিপি থেকে শুরু করে নালন্দার আকাশচুম্বী গ্রন্থাগার ভবন পর্যন্ত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই মানুষের অদম্য জ্ঞানতৃষ্ণা ও তা সংরক্ষণের প্রচেষ্টার সাক্ষী। আর আজকের দুনিয়ার কংগ্রেসে লাইব্রেরি থেকে ব্রিটিশ লাইব্রেরি ও সেই প্রাচীন লাইব্রেরিরই আধুনিক রূপ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়, লাইব্রেরি হলো সহস্র পথের চৌমাথা, যেখানে অতীত ও বর্তমানের সেতুবন্ধ ঘটে এবং মানুষের বিচিত্র চিন্তা ও বিশ্বাসের মিলন ঘটে। বর্তমান ডিজিটাল যুগেও গ্রন্থাগার আমাদের সঠিক তথ্যের দিশারি এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের এক অনন্য কেন্দ্র হিসেবে সমানভাবে সমাদৃত। বিবিধের আজকরের সংখ্যাটি সাজানো হয়েছে দুনিয়ার বিখ্যাত লাইব্রেরিগুলো নিয়ে

সভ্যতার অগ্রযাত্রায় তথ্যের সংরক্ষণ এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তা পৌঁছে দেওয়ার যে নিরন্তর প্রচেষ্টা, তার উজ্জ্বলতম নিদর্শন হলো প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলো। আদিম মানুষের

গুহাচিত্র থেকে শুরু করে মাটির ট্যাবলেট, প্যাপিরাস স্ক্রল, পার্চমেন্ট এবং সবশেষে কাগজের পাণ্ডুলিপি পর্যন্ত যে দীর্ঘ বিবর্তন, তা মানব মেধার এক বিস্ময়কর ইতিহাস।

প্রাচীন বিশ্বের গ্রন্থাগারগুলো শুধু পুস্তক সংগ্রহের স্থান ছিল না; বরং সেগুলো ছিল তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মেধাবীদের মিলনায়তন, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার এবং রাজনৈতিক আভিজাত্যের প্রতীক। আসুরবানিপালের রাজকীয় গ্রন্থাগার থেকে শুরু করে নালন্দার আকাশচুম্বী গ্রন্থাগার ভবন পর্যন্ত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই মানব সংস্কৃতির এক একটি মাইলফলক। এই প্রতিবেদনে প্রাচীন বিশ্বের প্রধান গ্রন্থাগারগুলোর স্থাপত্য, সংগ্রহ পদ্ধতি, ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং তাদের ধ্বংসের কারণগুলো এক নিবিড় গবেষণালব্ধ দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১. আসুরবানিপালের রাজকীয় গ্রন্থাগার

প্রাচীন মেসোপটেমীয় সভ্যতার ইতিহাসে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সবচেয়ে সুসংগঠিত এবং প্রাচীনতম রূপটি দেখা যায় খ্রিষ্টপূর্ব ৭ম শতাব্দীতে অ্যাসিরীয় সম্রাট আসুরবানিপালের রাজত্বকালে। নিনেভাহ (বর্তমান ইরাক) নগরীতে স্থাপিত এই গ্রন্থাগারটি শুধু মধ্যপ্রাচ্যের নয়, বরং বিশ্বের ইতিহাসের প্রথম আধুনিক গ্রন্থাগার হিসেবে স্বীকৃত, যেখানে ক্যাটালগিং বা শ্রেণিবিন্যাসের প্রাথমিক ধারণাটি বাস্তবায়িত হয়েছিল ।

আসুরবানিপাল (রাজত্বকাল ৬৬৮-৬২৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) ছিলেন এমন একজন শাসক যিনি যুদ্ধজয়ের পাশাপাশি বিদ্যার্জনেও নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। তার গ্রন্থাগারে প্রায় ৩০ হাজারেরও বেশি কীলকবর্ণের মাটির শিলালিপি এবং শিলালিপি খণ্ড সংরক্ষিত ছিল। এ শিলালিপিগুলো বিভিন্ন আকার ও আকৃতির ছিল। প্রশাসনিক ও আর্থিক লেনদেনের জন্য চারকোনা ট্যাবলেট এবং কৃষিবিষয়ক তথ্যের জন্য কিছুটা বাঁকানো বা বৃত্তাকার ট্যাবলেট ব্যবহৃত হতো।

এ গ্রন্থাগারের সংগ্রহের সিংহভাগ ছিল রাজকীয় দলিলপত্র, বৈদেশিক পত্রালাপ, আইনি নথিপত্র এবং ধর্মীয় রীতিনীতির বর্ণনা। সংগ্রহের ধরণ অনুযায়ী এখানে প্রায় ৬ হাজারটি প্রশাসনিক ও আইনি নথিপত্র ছিল, যাতে রাজকীয় ঘোষণা ও বিদেশের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি সংরক্ষিত থাকত।

সাহিত্যিক ভান্ডারের মধ্যে ১০টি বৃহৎ সংস্করণে গিলগামেশ মহাকাব্য ও সৃষ্টির আদি কাহিনীগুলো সংকলিত ছিল। এ ছাড়া ব্যাবিলনিয়া থেকে সংগৃহীত ১, ১২৮টি শিলালিপি খণ্ডে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও চিকিৎসার অমূল্য তথ্য ছিল। ভবিষ্যতের পূর্বাভাস ও মন্ত্রতন্ত্রবিষয়ক কয়েক হাজার শিলালিপিও এখানে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে রাখা হতো।

শিলালিপিগুলোকে বিষয় অনুযায়ী আলাদা আলাদা কক্ষে বিন্যস্ত করা হতো, যেমন ইতিহাস, আইন, বিজ্ঞান, জাদুবিদ্যা এবং লোকগাথা।

সম্রাট আসুরবানিপাল তার সংগ্রহের একটি বড় অংশ অর্জন করেছিলেন ব্যাবিলনিয়াসহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো থেকে জোরপূর্বক লুট করে। তবুও এ সংগ্রহের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন। শিলালিপিগুলোতে প্রায়ই সম্রাটের মালিকানা সূচক সিলমোহর বা কলোফন যুক্ত থাকত।

একটি শিলালিপিতে খোদাই করা সতর্কবাণীতে বলা হয়েছে যে, যদি কেউ এই লিপিগুলো চুরি করে বা নষ্ট করে, তবে ঈশ্বর যেন তাকে এবং তার বংশধরদের পৃথিবী থেকে মুছে দেন । ১৮৫০-এর দশকে পুরাতত্ত্ববিদ অস্টেন হেনরি লেয়ার্ড এবং হরমুজদ রাসাম এই ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন, যার অধিকাংশ বর্তমানে লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে।

২. আলেকজান্দ্রিয়ার মহাগ্রন্থাগার : হেলেনীয় বিশ্বের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক

৩২৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের মৃত্যুর পর তার সেনাপতি প্রথম টলেমি মিশরের শাসনভার গ্রহণ করেন এবং আলেকজান্দ্রিয়াকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কেন্দ্রে রূপান্তরের পরিকল্পনা করেন। আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার শুধু বইয়ের সংগ্রহশালা ছিল না, এটি ছিল 'মিউসেয়ন' মন্দিরের একটি অংশ, যা ছিল একাধারে একাডেমি এবং গবেষণাগার।

টলেমি রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় মিউসেয়নটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যেখানে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরা বাস করতে পারতেন এবং সরকারি অর্থায়নে গবেষণা চালাতে পারতেন। এখানে বসবাসকারী গবেষকদের কোনো কর দিতে হতো না এবং তাদের জন্য বিনামূল্যে খাবার ও থাকার ব্যবস্থা ছিল। স্ট্যাবো, ইউক্লিড এবং আর্কিমিডিসের মতো প্রথিতযশা বিজ্ঞানীরা এখানে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন। গ্রন্থাগারটিতে প্যাপিরাস স্ক্রলের সংখ্যা ৪ লাখ থেকে ৭ লাখ পর্যন্ত ছিল বলে ধারণা করা হয়।

সংগ্রহের উগ্র নীতি এবং শ্রেণিবিন্যাস

টলেমি রাজারা সংগ্রহের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উগ্র নীতি গ্রহণ করেছিলেন। আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে কোনো জাহাজ নোঙর করলে সেখানে তল্লাশি চালানো হতো এবং কোনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেলে তা জব্দ করে গ্রন্থাগারে নিয়ে আসা হতো।

লিপিকাররা সেই পাণ্ডুলিপির নকল তৈরি করতেন; মূল কপিটি প্রায়ই গ্রন্থাগার রেখে দিত এবং নকল কপিটি জাহাজের মালিককে ফেরত দেওয়া হতো। কলিমাচুস নামক একজন পণ্ডিত এই বিশাল সংগ্রহের একটি তালিকা তৈরি করেছিলেন যা 'পিনাকেস' নামে পরিচিত এবং একে বিশ্বের প্রথম গ্রন্থাগার ক্যাটালগ হিসেবে গণ্য করা হয়।

সেরাপিয়াম : ডটার লাইব্রেরি এবং পতন

আলেকজান্দ্রিয়ার মূল গ্রন্থাগারটি যখন ধারণক্ষমতা ছাড়িয়ে যায়, তখন টলেমি ৩য় ইউয়েরজেটসের আমলে 'সেরাপিয়াম' নামক মন্দিরে একটি উপ-গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়। এ গ্রন্থাগারটির ইতিহাস পর্যায়ক্রমিক পতনের এক করুণ কাহিনি।

খ্রিষ্টপূর্ব ৩য় শতাব্দীতে টলেমি রাজবংশের হাত ধরে এর প্রতিষ্ঠা হলেও, ৪৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে জুলিয়াস সিজারের গৃহযুদ্ধের সময় এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে এর পতন শুরু হয়। এরপর ২৭০-২৭৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে সম্রাট অরলিয়ানের আক্রমণে রাজকীয় এলাকা ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে মূল গ্রন্থাগারটিও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সবশেষে ৩৯১ খ্রিষ্টাব্দে বিশপ থিওফিলাস সেরাপিয়াম মন্দিরটি ধ্বংস করলে আলেকজান্দ্রিয়ার শেষ জ্ঞানভান্ডারটিও বিলুপ্ত হয়।

গ্রন্থাগার এবং বাতিঘরের প্রতীকী সংযোগ

আলেকজান্দ্রিয়ার ফ্যারোস বাতিঘর এবং গ্রন্থাগার উভয়ই টলেমি ২য় ফিলাডেলফাসের আমলে পূর্ণতা পায়। বাতিঘরটি যেমন নাবিকদের ফিজিক্যাল বা জাগতিক পথ দেখাত, গ্রন্থাগারটি তেমনি বুদ্ধিবৃত্তিক বা আত্মিক পথের দিশারি ছিল। বাতিঘরটি ছিল বিশাল এবং মিশরীয় স্থাপত্যের ধারক, অন্যদিকে গ্রন্থাগারটি ছিল গ্রিক মেধার আধার।

৩. পারগামামের গ্রন্থাগার : পার্চমেন্টের বিপ্লব এবং বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা

খ্রিষ্টপূর্ব ৩য় শতাব্দীতে প্রাচীন তুরস্কের পারগামাম (চবৎমধসড়হ) শহরে আট্টালিদ রাজবংশ এই গ্রন্থাগারটি নির্মাণ করে। এটি আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। গ্রন্থাগারটি গ্রিক দেবী অ্যাথেনার মন্দিরের সন্নিকটে স্থাপিত ছিল।

এতে চারটি প্রধান কক্ষ ছিল যার মধ্যে তিনটিতে বই রাখা হতো এবং অন্যটি আলোচনার জন্য ব্যবহৃত হতো। দেওয়াল এবং বইয়ের তাকগুলোর মধ্যে কিছুটা ফাঁকা রাখা হতো যাতে বাতাস চলাচল করতে পারে, যা প্যাপিরাস স্ক্রলগুলোকে আর্দ্রতা থেকে রক্ষা করত। রোমান যুগে এখানে প্রায় ১২ হাজার থেকে ১৩ হাজার পাণ্ডুলিপি ছিল।

প্যাপিরাস রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা এবং পার্চমেন্টের উদ্ভাবন

পারগামামের ক্রমবর্ধমান খ্যাতিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে মিশরের রাজা প্যাপিরাস রপ্তানি নিষিদ্ধ করে দেন। এ বাণিজ্যিক যুদ্ধের মুখে পারগামামের রাজা ২য় ইউমেনেস বিকল্প খোঁজার নির্দেশ দেন। তখন লিপিকাররা পশুর চামড়া প্রক্রিয়াজাত করে লেখার উপযোগী মাধ্যম তৈরি করেন, যাকে পারগামামের নামানুসারে 'পারগামানা' বা পার্চমেন্ট বলা হয়। পার্চমেন্ট ছিল প্যাপিরাসের চেয়ে অনেক বেশি টেকসই এবং এটি উভয় পিঠেই লেখা যেত, যা বই বা কোডেক্স (ঈড়ফবী) তৈরির পথ সুগম করে।

৪. প্যাপিরির উদ্যান

৭৯ খ্রিষ্টাব্দে ইতালির মাউন্ট ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতে হারকুলেনিয়াম শহরটি লাভার নিচে চাপা পড়ে। সেখানেই ১৮ শতকে আবিষ্কৃত হয় 'প্যাপিরির উদ্যান' নামক একটি ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার। ভিসুভিয়াসের প্রচণ্ড তাপে এবং অক্সিজেনহীন পরিবেশে গ্রন্থাগারের ১৮০০টি প্যাপিরাস স্ক্রল পুড়ে কয়লার মতো কালো হয়ে যায়। একে 'কার্বনাইজেশন' বলা হয়। প্রায় ৯০ ফুট আগ্নেয় ছাইয়ের নিচে চাপা থাকায় এগুলো পরিবেশের আর্দ্রতা ও ক্ষয় থেকে রক্ষা পায়। ১৮ শতাব্দীর আগে এ লিপিগুলো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

আধুনিক ইমেজিং প্রযুক্তি এবং পাঠোদ্ধার

কয়লার মতো ভঙ্গুর হওয়ায় এই স্ক্রলগুলো হাত দিয়ে খোলা অসম্ভব ছিল। বর্তমানে গবেষকরা বিভিন্ন অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন। এর মধ্যে মাল্টিস্পেক্ট্রাল ইমেজিং ইনফ্রারেড আলোর মাধ্যমে স্তরের ছবি তুলে কালো কালির সূক্ষ্ম পার্থক্য নির্ণয় করতে সাহায্য করে।

এক্স-রে টমোগ্রাফি প্রযুক্তির মাধ্যমে পাণ্ডুলিপিগুলোর ত্রিমাত্রিক রেন্ডারিং তৈরি করে ভেতরকার স্তরের গঠন শনাক্ত করা হচ্ছে। এ ছাড়া সিনক্রোট্রন বিকিরণ ব্যবহার করে কালির রাসায়নিক উপাদান বিশ্লেষণ ও নিখুঁত পাঠোদ্ধার সম্ভব হচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে সম্প্রতি গ্রিক শব্দ যেমন (মূর্খ), (ঘৃণা), এবং (জীবন) উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এ গ্রন্থাগারের অধিকাংশ কাজই ছিল এপিকুরিয়ান দার্শনিক ফিলোডেমাস-এর।

৫. রোমান ইমপেরিয়াল গ্রন্থাগারগুলো : ট্র্যোজান এবং সেলসাস

রোমান সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতা ও ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটত তাদের স্থাপত্য এবং গণ-গ্রন্থাগারের মাধ্যমে। সম্রাট ট্র্যোজান এবং সেলসাসের গ্রন্থাগার ছিল রোমান প্রকৌশল ও বিদ্যানুরাগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

১১২ খ্রিষ্টাব্দে রোমে নির্মিত এ গ্রন্থাগারটি ছিল ট্র্যোজান ফোরামের কেন্দ্রবিন্দু। এটি দ্বি-ভাষী (গ্রিক ও ল্যাটিন) সংগ্রহের জন্য বিখ্যাত ছিল এবং এর দুটি আলাদা ভবন বিখ্যাত ট্র্যোজান কলামের দুই পাশে অবস্থিত ছিল। এতে ২০ হাজারের বেশি স্ক্রল সংরক্ষিত ছিল।

এর দেওয়ালগুলো প্যাভোনাজ্জেট্টো নামক নীল শিরাযুক্ত সাদা মার্বেল দিয়ে সজ্জিত ছিল। দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে কাঠের আলমারি বা 'আর্মারিয়া' রাখা হতো। এ গ্রন্থাগারটি অন্ততপক্ষে ৫ম শতাব্দী পর্যন্ত টিকে ছিল এবং এখানে রাজকীয় আর্কাইভ ও সেনেট ডিক্রি সংরক্ষিত থাকত।

সেলসাসের গ্রন্থাগার

তুরস্কের ইফেসাসে ১২০ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত এ গ্রন্থাগারটি ছিল একাধারে একটি সমাধি এবং ১২ হাজার থেকে ১৬ হাজার স্ক্রলের এক বিশাল আধার । এর সম্মুখভাগটি অত্যন্ত অলংকৃত এবং এটিতে 'ফলস পারসপেক্টিভ' ব্যবহার করা হয়েছে যাতে ভবনটিকে বিশাল দেখায় । পাণ্ডুলিপিগুলোকে আর্দ্রতা থেকে বাঁচাতে দেয়ালগুলো ছিল দ্বি-স্তরের। এ ফাঁকা জায়গাটি বাতাসের কুশন হিসেবে কাজ করত এবং স্ক্রলগুলোকে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করত।

৬. কনস্ট্যান্টিনোপেলের ইমপেরিয়াল গ্রন্থাগার

পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর বাইজান্টাইন রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপল ছিল গ্রিক ও রোমান সাহিত্যের শেষ আশ্রয়স্থল। ৪র্থ শতাব্দীতে সম্রাট কনস্ট্যান্টাইন দ্য গ্রেট এ গ্রন্থাগারটির ভিত্তি স্থাপন করেন। প্যাপিরাস স্ক্রলগুলো খুব দ্রুত নষ্ট হয়ে যেত। এই গ্রন্থাগারের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার নষ্টপ্রায় প্যাপিরাস স্ক্রল থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তা মজবুত পার্চমেন্ট বা চামড়ার স্ক্রলে স্থানান্তর করা। এর ফলে হোমার এবং অ্যারিস্টটলের মতো প্রাচীন দার্শনিকদের কাজগুলো বিলুপ্তি থেকে রক্ষা পেয়েছে। ১২০৪ সালে চতুর্থ ক্রুসেডের সময় এই গ্রন্থাগারটির ব্যাপক ক্ষতি হয়।

৭. বাগদাদের জ্ঞানের ঘর : হাউস অফ উইজডম

ইসলামের স্বর্ণযুগে বাগদাদ হয়ে উঠেছিল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র। আব্বাসীয় খলিফা হারুন-আল-রশিদ এবং আল-মামুনের হাত ধরে ৮০০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ হাউস অফ উইজডম বা 'বাইত আল-হিকমাহ' পূর্ণতা পায়। হাউস অফ উইজডম ছিল বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অনুবাদ প্রকল্পের কেন্দ্রস্থল। খলিফা আল-মামুন গ্রিক, ভারতীয়, ফার্সি এবং সিরিয়াক ভাষার পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের জন্য বিশেষ দূত প্রেরণ করতেন। দর্শনের ক্ষেত্রে অ্যারিস্টটলের টপিকসসহ গ্রিক ভাষার বহু মূল্যবান কাজ এখানে অনূদিত হয়েছিল।

ভারতীয় গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের আকর গ্রন্থ যেমন ব্রহ্মগুপ্তের ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত এবং খণ্ডখাদ্যক আল-ফাজারি ও ইয়াকুব ইবনে তারিক অনুবাদ করেন। এ ছাড়া চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষায় রচিত সুশ্রুত ও চরক সংহিতা অনূদিত হয়, যা শল্যচিকিৎসা ও আয়ুর্বেদের প্রসারে ভূমিকা রাখে । জ্যামিতির মৌলিক গ্রন্থ এলিমেন্টস-ও গ্রিক থেকে এখানে আরবিতে রূপান্তরিত হয়।

১২৫৮ সালে মঙ্গোল নেতা হালাকু খাঁ বাগদাদ আক্রমণ করেন। মঙ্গোলরা হাউস অফ উইজডমের লাখ লাখ পাণ্ডুলিপি টাইগ্রিস নদীতে ফেলে দেয়। কিংবদন্তি আছে যে, বইয়ের কালিতে টাইগ্রিসের পানি কালো হয়ে গিয়েছিল এবং মানুষের রক্তে তা লাল হয়ে গিয়েছিল। এ ধ্বংসযজ্ঞ মুসলিম বিশ্বের এবং বৈশ্বিক বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক অপূরণীয় ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত হয়।

৮. প্রাচীন ভারতের বিহারে অবস্থিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বিশ্বের প্রথম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। এর গ্রন্থাগার কমপ্লেক্সটি 'ধর্মগঞ্জ' বা 'সত্যের পর্বত' নামে পরিচিত ছিল।

ধর্মগঞ্জ গ্রন্থাগারটি মূলত তিনটি বিশাল ভবনের সমন্বয়ে গঠিত ছিল :

রত্নসাগর : এর অর্থ 'রত্নের সমুদ্র'। এখানে প্রধানত সাহিত্য, শিল্পকলা এবং সাধারণ পাঠ্যপুস্তক সংরক্ষিত থাকত।

রত্নোদধি : এটি ছিল নয় তলা বিশিষ্ট একটি বিশাল ভবন। এখানে সবচেয়ে পবিত্র বৌদ্ধ ধর্মীয় শাস্ত্র এবং বিরল পাণ্ডুলিপিগুলো রাখা হতো।

রত্নরঞ্জক : এটি ছিল 'রত্নখচিত' ভবন, যেখানে বিজ্ঞান, গণিত এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত ছিল।

চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং ৭ম শতাব্দীতে এখানে অধ্যয়ন করেন এবং তিনি বর্ণনা করেছেন যে, গ্রন্থাগারটি এতটাই সমৃদ্ধ ছিল যে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে পাণ্ডুলিপি কপি করার জন্য আসত। এখানে ১০ হাজার শিক্ষার্থী এবং ২ হাজার শিক্ষক বাস করতেন। নালন্দায় শুধু বৌদ্ধ শাস্ত্র নয়, বরং বেদ, ব্যাকরণ, যুক্তিবিদ্যা এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ে ব্যাপক চর্চা হতো।

১১৯৩ থেকে ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে তুর্কি সেনাপতি বখতিয়ার খলজি নালন্দা আক্রমণ করেন। তিনি ভিক্ষুদের হত্যা করার পর গ্রন্থাগারটিতে আগুন ধরিয়ে দেন। বলা হয়, গ্রন্থাগারের বিশাল সংগ্রহটি এতই বড় ছিল যে তা তিন থেকে ছয় মাস পর্যন্ত জ্বলছিল। নালন্দার ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডারের একটি বিশাল অংশ চিরতরে হারিয়ে যায়।

প্রাচীন গ্রন্থাগারের বিবর্তন ও ধ্বংসের কারণ

প্রাচীন বিশ্বের এই জ্ঞানকেন্দ্রগুলোর পতন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যুদ্ধ, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং ধর্মীয় উন্মাদনা দায়ী ছিল। তবে কিছু গ্রন্থাগার প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত বা ভূমিকম্পের কারণেও ধ্বংস হয়েছে।

আসুরবানিপালের গ্রন্থাগারটি নিনেভাহর পতন ও যুদ্ধের কারণে মাত্র ৫০ বছর টিকে ছিল। আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার অগ্নিকাণ্ড ও ধর্মীয় দাঙ্গায় আক্রান্ত হয়েও প্রায় ৭০০ বছর তার গৌরব ধরে রেখেছিল। পারগামামের গ্রন্থাগার রোমানদের অবহেলার কারণে ৩০০ বছর পর স্তিমিত হয় এবং প্যাপিরির উদ্যান মাউন্ট ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতে ১০০ বছরের মাথায় বিলীন হয়।

রোমের ট্র্যোজান গ্রন্থাগার ভূমিকম্প ও লুণ্ঠনের শিকার হওয়ার আগে ৪৫০ বছর টিকে ছিল। বাগদাদের হাউস অফ উইজডম মঙ্গোলদের আক্রমণে ৪৫০ বছর পর ধ্বংস হয় এবং নালন্দার আকাশচুম্বী গ্রন্থাগার বখতিয়ার খলজির আক্রমণে ধ্বংস হওয়ার আগে প্রায় ৭০০ বছর আলো ছড়িয়েছে।

প্রাচীন এ গ্রন্থাগারগুলো শুধু অতীত নয়, বরং আমাদের বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিত্তি। আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে প্যাপিরির উদ্যানের মতো হারিয়ে যাওয়া গ্রন্থাগারগুলোর পাঠোদ্ধার আজ সম্ভব হচ্ছে, যা আমাদের সামনে এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিচ্ছে। প্রাচীন গ্রন্থাগারের এ ইতিহাস শুধু প্রাপ্তি ও হারানো বা ধ্বংসের গল্প নয়; এটি মানুষের সত্য ও জ্ঞানের প্রতি চিরন্তন ক্ষুধার এক মহাকাব্য।

পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর বাইজান্টাইন রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপল ছিল গ্রিক ও রোমান সাহিত্যের শেষ আশ্রয়স্থল। ৪র্থ শতাব্দীতে সম্রাট কনস্ট্যান্টাইন দ্য গ্রেট এ গ্রন্থাগারটির ভিত্তি স্থাপন করেন। প্যাপিরাস স্ক্রলগুলো খুব দ্রুত নষ্ট হয়ে যেত।

এই গ্রন্থাগারের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার নষ্টপ্রায় প্যাপিরাস স্ক্রল থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তা মজবুত পার্চমেন্ট বা চামড়ার স্ক্রলে স্থানান্তর করা। এর ফলে হোমার এবং অ্যারিস্টটলের মতো প্রাচীন দার্শনিকদের কাজগুলো বিলুপ্তি থেকে রক্ষা পেয়েছে। ১২০৪ সালে চতুর্থ ক্রুসেডের সময় এই গ্রন্থাগারটির ব্যাপক ক্ষতি হয়।

নিভৃতে আলো ছড়িয়ে যাওয়া একজন

বিচিত্রি ডেস্ক

প্রচারের আলো এড়িয়ে চলেছেন সব সময়। নিভৃতে কাজ করে যেতেই তার আনন্দ।

তাই সাক্ষাৎকার দেওয়ার প্রস্তাব শুনেই মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'এটা তো সমাজের প্রতি আমার দায়িত্ব। প্রচারের কী দরকার?'

'আপনার এই কাজের কথা জানলে হয়তো আরো অনেকে এগিয়ে আসবেন। ভালো কাজে অন্যদের উদ্বুদ্ধ করাড়এটাও তো সমাজের প্রতি এক ধরনের দায়িত্ব'ড়এটা শুনে নিমরাজি হলেন।

মুঠোফোনে বললেন, 'আচ্ছা, কাল সকাল ১১টার দিকে আসুন।'

যথাসময়ে হাজির হলাম হাতিরপুলের বাসায়। একেবারে সড়ক লাগোয়া বাড়ি। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই যে ভেতরে কতটা খোলামেলা আর সবুজ।

ঘাস, কলাগাছ আর হরেক রকম ফুল-ফলে ছেয়ে আছে বাসার পেছনের খোলা জায়গাটা।

কলিং বেল বাজাতেই এগিয়ে এলেন ভদ্রলোক। হাসিমুখে বললেন, 'আমি মবিনুল। আসুন।'

ভেতরে ঢুকতেই কানে এলো রবীন্দ্রসংগীতড়ক্লান্তি আমায় ক্ষমা করো প্রভু।' ড্রয়িং রুমের দেয়ালে শোভা পাচ্ছে সফিউদ্দিনের মতো দেশীয় শিল্পীদের নানা চিত্রকর্ম।

আলমারি ঠাসা বই। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল থেকে শুরু করে পিকাসোর আলোকচিত্র নিয়ে লেখা বইও আছে সারিতে।

পুরো নাম মীর মবিনুল হক। সদালাপী মানুষটির একদম সাদাসিধে জীবন। বললেন, তাই গোছগাছের জন্য আপনাকে বেশি সময় দিতে পারব না। এ জন্য দুঃখিত।'

মবিনুল হক দীর্ঘদিন ধরে কানাডায় থাকেন। কিছুদিন আগে দেশে আসেন। বললেন, 'এবার হাতে সময় কম ছিল। যে কাজের জন্য আসা, অল্প সময়ে সেটা করতে পারব কি নাড়সংশয় ছিল। পেরেছি বলে তৃপ্তি নিয়ে ফিরতে পারছি।'

কিসে তৃপ্তি তাঁর? : মবিনুল হকের আত্মতৃপ্তির মূলে তিনি নিজেই। গবেষণার উন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ভূতত্ত্ব বিভাগে এক কোটি টাকার এনডাউমেন্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে ২ জুন। নাম 'মীর ময়নুল হক অ্যান্ড জন ট্যালেন্ট মেমোরিয়াল এনডাউমেন্ট ফান্ড'। ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থী মীর ময়নুল হক এবং ঢাবিতে তাঁর এমএস তত্ত্বাবধায়ক প্রাক্তন ইউনেসকো অধ্যাপক ড. জন আলফ্রেড ট্যালেন্টের স্মৃতি রক্ষার্থে এই ফান্ড। মীর ময়নুল হকের ছোট ভাই এই মবিনুল হক। তিনি সেদিন এক কোটি টাকার চেক হস্তান্তর করেন ঢাবির প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালামের কাছে। এনডাউমেন্ট ফান্ডের ৩০ লাখ টাকা দিয়ে ভূতত্ত্ব বিভাগে 'ময়নুল-ট্যালেন্ট গ্র্যাজুয়েট রিসার্চ ল্যাবরেটরি' স্থাপন করা হবে। অবশিষ্ট ৭০ লাখ টাকার লভ্যাংশ থেকে গ্র্যাজুয়েট রিসার্চারদের পিএইচডি ও এমফিল গবেষণা, এমএস ফেলোশিপ, স্কলারশিপ ও ফিল্ড ওয়ার্কসংক্রান্ত কাজে ব্যবহার করা হবে।

বিরল দৃষ্টান্ত : অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম বলেন, 'এই অনুদান বিভাগের গবেষণা কার্যক্রমের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।'ভূতত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. বদরুদ্দোজা মিয়া বললেন, 'ভূতত্ত্ব বিভাগের ইতিহাসে এত বড় অনুদান আর কেউ দিয়েছে বলে জানা নেই। বিভাগে ভালোমানের ল্যাব ছিল না। এখন সেই অভাব পূরণ হবে। নিজের সম্পদ বিক্রি করে সব অর্থ অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন ড. মবিনুল। এমন দৃষ্টান্ত বিরল!'

বাংলাদেশের ভূ-বিজ্ঞান অঙ্গনের উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন মীর ময়নুল হক। বাপেক্সের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মর্তুজা আহমেদ ফারুক বলেন, 'পেট্রোবাংলা এবং বাপেক্সে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে কর্মরত ছিলেন তিনি। দেশের বহু গুরুত্বপূর্ণ গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারে মৌলিক ভূমিকা ছিল মীর ময়নুলের। তাঁর উদ্যোগে পেট্রোবাংলা ড্রিলিং ডেটো রিয়েল-টাইমে পর্যবেক্ষণের জন্য প্রথমবারের মতো একটি কম্পিউটারাইজড মাড-লগিং ইউনিট সংগ্রহ করে, যা বিদেশি বিশেষজ্ঞদের ওপর নির্ভরতা কমায়। মীর ময়নুলের নেতৃত্বে পরিচালিত তিতাস গ্যাসক্ষেত্রের রিজার্ভ পুনর্মূল্যায়নে ২.১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট থেকে বেড়ে ৭.৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত হয়। এই মূল্যায়নের ভিত্তিতেই নতুন করে ১৩টি কূপ খনন করা হয়। ২০২০ সালের ২৬ আগস্ট তিনি পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেন।

বিলিয়ে দিয়েছেন সব : শুধু ভাইয়ের নামে নয়, মা-বাবার নামেও ফান্ড গড়েছেন মবিনুল হক। উত্তরাধিকার সূত্রে বেশ কিছু সম্পত্তি পেয়েছিলেন তিনি। অর্থমূল্যে সেটা কয়েক কোটি টাকা। নিজের জন্য কিছু না রেখে সব অর্থ দান করেছেন মানুষের কল্যাণে। জনহিতকর কাজে মোটা অঙ্কের অর্থ দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদসহ আরো কয়েক জায়গায়। উদ্দেশ্য একটাইড় কিছু মানুষ যেন ভালো থাকে। বললেন, 'দেশে আমার সব সম্পদ মানুষের জন্য দান করেছি। আসলে দেশের সম্পদ দেশের মানুষের কাজে ব্যবহার করতে চেয়েছি।'

অল্প বয়সে বাবাকে হারানো মবিনুল ভাই-বোনের সমর্থনে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পেয়েছেন। এ জন্য নিজেকে তিনি অনেক ভাগ্যবান মনে করেন। বললেন, 'কষ্ট পাই, যখন দেখি অহেতুক খরচের নেশায় মত্ত মানুষ। আমি মনে করি, জীবন যাপনের জন্য খুব বেশি কিছু দরকার নেই। যতটা পারা যায় সবার সঙ্গে ভাগাভাগি করে চললে সকলে মিলে ভালো থাকা যায়। নিজের যোগ্যতায় যারা এগোতে চায়, তাদের সাহায্য করাই আমার মূল লক্ষ্য।' তিনি বলেন, 'দেখেছি, শিক্ষার সুযোগ পেলে কিভাবে ছাত্রদের জীবন বদলে যায়। ফান্ডগুলো গঠনের উদ্দেশ্য শিক্ষা ও গবেষণার প্রসার, নারীদের জীবনমান উন্নয়ন, যাতে অর্থাভাবে কেউ পিছিয়ে না পড়ে।'

চার দশকের শিক্ষক জীবন : ছয় ভাই-বোনের মধ্যে সবার ছোট মীর মবিনুল হক। বাবা মীর আশরাফুল হক ছিলেন পুলিশ কর্মকর্তা। সেই সূত্রে দেশের নানা জায়গায় কেটেছে শৈশব। মাত্র ৪৮ বছর বয়সে ১৯৬৪ সালে ক্যান্সারের কাছে হার মানেন বাবা। তখন মবিনুল পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। এরপর পরিবারের হাল ধরেন মা জোবেদা হক। সন্তানদের নিয়ে তিনি থিতু হন ঢাকায়।

ঢাকার গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল থেকে ১৯৭০ সালে ম্যাট্রিক পাস করেন মবিনুল। ঢাকা কলেজ থেকে এইচএসসি পাসের পর ১৯৭৩ সালে সুযোগ মেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে। মুহসীন হলের ছাত্র ছিলেন। স্নাতকে প্রথম হয়েছিলেন। স্নাতকোত্তর শেষে বছরখানেক শিক্ষকতা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে।

১৯৮০ সালে উচ্চ শিক্ষা নিতে জমান কানাডায়। ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন অন্টারিওতে অর্থনীতিতে মাস্টার্স করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করেন। পিএইচডি চলাকালেই ১৯৮৪ সালে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন ইউনিভার্সিটি অব সাসকাচেওয়ানে। দীর্ঘ ৩৯ বছর সেখানে শিক্ষকতা করেছেন। এর মধ্যে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে যান যুক্তরাষ্ট্র, চীনসহ বিশ্বের বিভিন্ন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ২০২৩ সালে পেশাগত জীবন থেকে অবসর নেন। ব্যক্তিগত জীবনে এক সন্তানের জনক তিনি। ছেলে আইনজীবী।

সহায় রবীন্দ্রনাথ : শিক্ষকতা ছাড়লেও ড. মবিনুল মাইক্রো ইকোনমিকস নিয়ে লেখালেখি করছেন নিয়মিত। তাঁর স্ত্রীও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রী ছিলেন। স্বামী-স্ত্রী দুজন মিলে প্রায়ই ঘুরে বেড়ান। বললেন, 'কাছ থেকে বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি অবলোকন করা আমার শখ। তাই ঘাসে ঘাসে পা ফেলি।' সুখে-অসুখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান-কবিতায় শান্তির অন্বেষণ করেন ড. মবিনুল।

বেশি কিছু চাওয়ার নেই : দেশে তো কোনো সম্পদ নেই। তাহলে পরবর্তী জীবনে চলবেন কিভাবে? এমন প্রশ্নের জবাবে ড. মবিনুল হেসে বললেন, 'জীবনে খুব বেশি কিছু চাওয়ার নেই আমার। সুস্থ থেকে ডাল-ভাত খেয়ে বাঁচতে পারলেই হলো।'

সমাজে ধনী-গরিবের বৈষম্য খুব পীড়া দেয় ড. মবিনুলকে। সেদিক থেকে সম্পদের পুনর্বণ্টনে বিশ্বাসী তিনি। নিজে যে পৈতৃক সম্পত্তি পেয়েছেন, এটাও ভাগ্যের ব্যাপার বলে মনে করেন তিনি। বললেন, 'এমন একটা পরিবারে জন্ম নিয়েছি বলেই আমি এই সম্পত্তি পেয়েছি। সেটা আসলে এই সমাজেরই প্রাপ্য। মানুষের দুর্ভোগ দেখে মনে হয়েছে, এটা যত কমানো যায় তত ভালো।'

NESCO

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই পিএলসি
Northern Electricity Supply PLC
(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)
দপ্তরঃ বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১, নেসকো, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
ই-মেইল নম্বরঃ xen.snd1.chapai@nesco.gov.bd

Memo No: 27.29.7000.032.62.046.26-272 Date: 16/06/2026

e-Tender Notice

This is an online tender, where only e-Tender will be accepted in the National e-GP portal and no offline/hard copies will be accepted. The Tenderers who are registered in the National e-GP portal (http://www.eprocure.gov.bd) are eligible to participate in this Tender. The fees of downloading the e-Tender Documents of following Packages from the National e-GP System portal have to be deposited online through any registered Bank's Branches up to the following Date & Time.

Package No.	Tender ID	Package Description	Publication on e-GP	Last Date & Time of selling Tender Documents	Tender Closing Date & Time
2025-26/SHIB GANJ/NS-02	1299843	Procurement of Non-Consulting Service of Outsourcing Manpower Service of Shibganj Electricity Supply, NESCO, Chapainawabganj (01 Nos Computer Operator, 01 Nos Driver, 01 Nos MLSS)	16-Jun-2026 22:00	28-Jun-2026 08:00	28-Jun-2026 10:00

sd/-
(S. M. Mohaiminur Rahman)
Executive Engineer
Sales and Distribution Division-1
NESCO, Chapainawabganj.

জিএড নং- ২৭০/২৫, ৩x৩/ক